একক ১ □ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতের রাজনীতি এবং গান্ধী

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতবর্ষ

১.৩ মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইন

১.৩.১ সম্ভাবনা

১.৩.২ অসন্তোষ

১.৪ গান্ধীর আবির্ভাব এবং প্রাথমিক আন্দোলনসমূহ

১.৪.১ চম্পারন সত্যাগ্রহ

১.৪.২ খেড়া সত্যাগ্রহ

১.৪.৩ আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ

১.৪.৪ রাওলাট সত্যাগ্রহ

১.৫ ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর ভূমিকা

১.৫.১ গান্ধী,সত্যাগ্রহ এবং অহিংস আন্দোলনের আদর্শ

১.৫.২ গান্ধীর আবেদন এবং জনপ্রিয়তা

১.৬ সারাংশ

১.৭ অনুশীলনী

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনি জানবেন ঃ

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি।
- ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর উত্থানের প্রেক্ষাপট।
- রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধীর জনসাধারণের কাছে আবেদনের কারণ।

১.১ প্রস্তাবনা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তথা ভারতের রাজনৈতিক জীবনে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর অবদান শত্রু-মিত্র সকলের কাছেই অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক এবং আদর্শগত ভাবে যারা গান্ধীর সঙ্গে একমত নন তাঁরাও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীর নেতৃত্বকে খাটো করে দেখেন না, কারণ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গান্ধী ছিলেন ভারতীয় রাজনীতির এবং রাজনৈতিক চেতনার মূর্ত প্রতীক। এই এককে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট আলোচিত হবে।

এই এককের মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন কীভাবে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধী সর্বভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং অচিরেই ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। সবশেষে গান্ধীর রাজনৈতিক আদর্শ এবং তাঁর আবেদন, উভয়ের মাধ্যমে গান্ধীর নেতা হিসাবে জনপ্রিয়তার কারণ আলোচিত হবে।

১.২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতবর্ষ

১৯১৪ সালে ইউরোপের একটি হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন কেউই অনুমান করতে পারেনি যে সেই যুদ্ধ প্রায় চার বছর ধরে চলবে, এবং রণাঙ্গন হবে বিশ্বের একটা বড় অংশ। যুদ্ধ চলতে থাকার ফলে বিশ্বের বহু অংশে অপ্রত্যাশিত কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলতে থাকে। যুদ্ধরত অবস্থায় ব্রিটেনকে আর্থিক এবং সামরিক সাহায্যের জন্য বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিকে তাকাতে হয়। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা অর্থাৎ সাম্রাজ্যের যে সমস্ত অঞ্চলে খানিকটা স্বশাসন আগেই দেয়া হয়েছিল তারা ডমিনিয়ন (Dominion) স্বশাসনের মাত্রা বাড়ানোর শর্তে ব্রিটিশ সামরিক প্রয়াসকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল। ভারতবর্ষ তখন স্বশাসনের অধিকার না পাওয়াতে ভারতের ব্রিটিশ শাসকেরাই নিঃশর্তে ভারতবর্ষের তরফে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন।

ভারতীয় রাজনীতিবিদরাও অবশ্য ব্রিটেনের যুদ্ধপ্রয়াসে অকুণ্ঠ সমর্থনের ঘোষণা করেন, এবং অনেকেই (যেমন তিলক, পরে গান্ধী) যুদ্ধ প্রয়াসকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিবিদদের আশা ছিল যুদ্ধ শেষ হলে ভারতবর্ষ অন্যান্য ডমিনিয়নের মত স্বশাসন পাবে। বালগঙ্গাধর তিলক এবং অ্যানি বেসান্ত "হোমরুল" আন্দোলন গড়ে তোলেন ১৯১৬ সালে থেকে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল স্বশাসনের পক্ষে জনমত গড়ে তুলে স্বশাসন বা Home Rule -এর দাবি জোরদার করা।

এ সময়ে ব্রিটিশ সরকারও প্রথমে পরোক্ষভাবে এবং পরে প্রত্যক্ষভাবে এই আশার পুষ্টি করে। ১৯১৭ সালে ভারতসচিব এডউইন মন্টেগু ঘোষণা করেন যে ক্রমশ স্বায়ত্বশানমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দায়িত্বশীল সরকার স্থাপন করাই ভবিষ্যতের ব্রিটিশ নীতি। ফলে ভারতের রাজনীতিতে সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা যায়।

ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব পড়ে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতবর্ষ থেকে শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়তে থাকে, এবং শিল্পদ্রব্যের যোগান সমানুপাতে না

বাড়ায় পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। একই সময়ে কৃষিজাত পণ্যের ক্ষেত্রেও মূল্যবৃদ্ধি হতে থাকে, যার মূল প্রভাব পড়ে সাধারণের ভোগ্য কৃষিপণ্যের ওপর। বস্তুত কৃষিপণ্যের বাণিজ্যীকরণের সূচনার সময় থেকেই, অর্থাৎ ১৮৭০-এর দশক থেকেই উন্নতমানের কৃষিপণ্য (যেমন ধান, গাম) চাষের প্রবণতা বাড়ে, এবং সাধারণ গ্রামবাসীর মূল খাদ্য পণ্য (জোয়ার, বাজরা, অড়হড়) চাষের প্রবণতা কমে। ফলে ধান বা গমের মূল্যবৃদ্ধির থেকেও বেশী বৃদ্ধি হয় অনুন্নত মানের কৃষিপণ্যের। যুদ্ধকালীন চাহিদা যোগানের থেকে অনেক বেশী হওয়াতে যেখানে গমের দাম ৫০% মতন বাড়ে সেখানে বাজরার মূল্য হয়ে যায় প্রায় দ্বিগুণ। তাই, যুদ্ধের ফলে লাভবান কিছু লোককে বাদ দিলেও ভারতবর্ষের সংখ্যা গরিষ্টের জীবনযাত্রার মানে অবনতি দেখা দেয়।

জীবনযাত্রার মানের অবনতি আরও প্রকট হয়ে ওঠে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে। সরকারি রাজস্ব নীতিতে কৃষকের বিপন্নতা আরও বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধকালীন সেনাবাহিনীতে সৈন্য নিয়োগের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কিছুটা ভার লাঘব হলেও ১৯১৮ সালে যুদ্ধ শান্তির পরে সেনারা ঘরে ফিরলে গ্রামীণ অর্থনীতির সংকট এক নতুন মাত্রা পায়। ঘরে ফেরা সৈনিকদের কৃষি অর্থনীতিতে পুনর্বার কর্মসংস্থান সহজ ছিল না। বিশেষত যুদ্ধকালীন কৃষি পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ায়। একই ভাবে নগরাঞ্চলেও যুদ্ধ-ফেরত সেনাকে বিকল্প কর্মের সন্ধান দেয়া মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায়—বিশেষত যুদ্ধকালীন শিল্পপণ্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায়।

সব মিলিয়ে ১৯১৮ সালে যুদ্ধের অবসানের সময় ভারতবর্ষে আশা-হতাশার দোলচল দেখা দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতেই পাশ হয় ভারত শাসন আইন।

১.৩ মন্টেগু চেম্‌সফোর্ড আইন

১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন (Government of India Act) পাশ হয়। ভারত সচিব এডউইন মন্টেগু এবং ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের নামানুসারে এটিকে মন্টেগু চেমসফোর্ড বা মন্ট-ফোর্ড আইনও বলা হয়।

মন্ট-ফোর্ড আইনে সর্বভারতীয় এবং প্রাদেশিক শাসনকাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সৃষ্টি হয়। (কাউন্সিল অফ্ স্টেট এবং লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লী) যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই হবে নির্বাচিত, কিন্তু শাসনবিভাগের ওপর আইনসভার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

প্রাদেশিক সরকারের ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হয় দ্বৈতশাসন (Dyarchy)। এর মাধ্যমে কয়েকটি মন্ত্রকের (যেমন, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি) ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের নির্বাচিত প্রাদেশিক আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ করে দেয়া হয়।

ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকের সংখ্যা প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫৫ লক্ষ, এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষেত্রে তা হয় ১৫ লক্ষ। মুসলিম এবং অন্য সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচক মন্ডলীতেও ভোটারের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায়।

মন্ট-ফোর্ড আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ-আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং ভারতীয় সহযোগীদের সংখ্যাবৃদ্ধি। বিশ্বযুদ্ধের জন্য যে ঋণভার ব্রিটেনকে বহন করতে হচ্ছিল তার থেকে অব্যাহতি পেতে সাম্রাজ্যের সর্বত্র রাজস্ব আদায় এবং ব্যায় উভয়ই আঞ্চলিক প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়ে কেন্দ্রীয় কাঠামোর ওপর ভার-লাঘব করাই ছিল শ্রেষ্ঠ পন্থা। ব্রিটিশ রাজনেতাদের অভিপ্রায় ছিল এই আর্থিক-প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের যুক্ত করে দেয়া। ভারতীয় নেতারা আঞ্চলিক শাসনের সঙ্গে যুক্ত হলে তাঁদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা অনেকটা প্রশমিত হবে, এবং তাঁরা সাম্রাজ্যের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের সহজেই মিলিয়ে নিতে পারবেন—এতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহযোগীদের সংখ্যাবৃদ্ধি হবে।

১.৩.১ সম্ভাবনা

ব্রিটিশ সরকারের অভীষ্ট যাই থাকুক না কেন, মন্ট-ফোর্ড আইন ভারতীয় রাজনীতিতে এক ব্যাপক পরিবর্তন আনে। ১৯১৯-এর ওই আইনের সম্ভাবনাগুলি তৎকালীন রাজনীতিবিদদের চোখ এড়িয়ে যায়নি, যদিও সবকটি সম্ভাবনাই য়ে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, তাও নয়।

ভোটার সংখ্যা একবারে বহুগুণ হয়ে যাওয়ায় অকস্মাৎ সমাজের অনেক স্তরের লোকেদের রাজনৈতিক তাৎপর্য বেড়ে যায়। ফলে প্রাক-যুদ্ধ পর্বে যে দেখা মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবী-দাওয়াতে, তা ১৯১৯-এর পরে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। রাজনীতির পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের প্রয়োজন থেকে জন্ম নেয় জনমুখী রাজনৈতিক আন্দোলন, যাতে সমাজের বহু উপেক্ষিত মানুষের সমস্যা জনসমক্ষে চলে আসে। তৎকালীন নেতাদের অগোচরেই ভারত গণতন্ত্রের পথে চলতে শুরু করে।

প্রাদেশিক শাসনভারের সীমিত বিকেন্দ্রীকরণ যুদ্ধ-পূর্ব পর্বের হতাশাব্যাঞ্জক আবহের আবসান ঘটায়। সরকারী নীতি প্রণয়ন এবং কার্যকর করার ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে অংশগ্রহণ করার অধিকার দেবার ফলে ভারতীয় নেতাদের সামাজিক তথা রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। আপাতদৃষ্টিতে এতে ব্যক্তি রাজনীতিবিদের লাভ হলেও, প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতির গুরুত্ব এবং কার্যকারীতা জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হবার অবকাশ জন্মায়। পরবর্তীকালীন রাজনীতির ধারা এই সম্ভাবনাকে আরও প্রকট করে দেয়।

১.৩.২ অসন্তোষ

মন্ট-ফোর্ড আইনে সন্তুষ্টির তুলনায় অসন্তোষের সঞ্চার বেশি হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি ভারতে যে প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিল, ১৯১৯ সালের দ্বৈত শাসন প্রকল্প তার খুব অল্পই পূরণ করতে সক্ষম হয়। মন্ট-ফোর্ড আইন ছাড়াও, যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে একাধিক কারণে ক্ষোভের সঞ্চার হয় যা রাজনৈতিক হতাশাকে আরও তীব্র হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

দ্বৈতশাসনের অন্যতম ত্রুটি ছিল ভারতীয়দের হাতে তুলে দেয়া মন্ত্রকগুলির চরিত্র থেকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি মন্ত্রকগুলিতে ক্ষমতা ছিল কম কিন্তু দায়িত্ব ছিল বেশি। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে ব্রিটিশ নীতির জন্য ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল। নীতির সার্বিক পরিবর্তনের প্রয়োজন থাকলেও তার জন্য

আবশ্যক অর্থ মন্ত্রকগুলির হাতে ছিল না। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক ব্রিটিশ পদাধিকারীদের হাতে ছিল; এবং ভারতীয়দের হাতে তুলে দেয়া মন্ত্রকের নেয়া যে কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করার অধিকার প্রাদেশিক গভর্ণর এবং ভারতের ভাইসরয়ের থাকার ফলে কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটানোয় সাংবিধানিক সমস্যাও ছিল। ফলে বহু ভারতীয়ের মনে হয়েছিল যে মন্ট-ফোর্ড আইনের মাধ্যমে শাসনের ক্ষেত্রে খুব অল্পই স্বাধিকার দেয়া হয়েছে।

এই হতাশা যুদ্ধোত্তর সামাজিক পরিস্থিতির জন্য রাজনৈতিক ভাবে আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল। কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, শিল্পক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন চাহিদার অবসানের দরুণ শিল্পক্ষেত্রে মজুরী হ্রাস এবং কর্মী ছাঁটাই, যুদ্ধফেরত সৈনিকদের পুন কর্মসংস্থানের সমস্যা— সব মিলিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব চরমে ওঠে। মন্ট-ফোর্ড আইনে ভোটাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ধরনের সমস্যা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেতে শুরু করে।

অতএব, ১৯১৯ সালে ভারতবর্ষে তীব্র রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য পরিস্থিতি অনুকূল ছিল। রাজনৈতিক এবং সামাজিক অসন্তোষের মিশ্রণের ফলে অসহিষ্ণুতা উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্র একই সময়ে দেখা দেয়ায় দেশব্যাপী আন্দোলনের সম্ভাবনাও ছিল উজ্জ্বল। প্রয়োজন ছিল দেশব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা সম্পন্ন কোন নেতা বা সমষ্টিগত নেতৃত্বের। এই পটভূমিকাতেই রাজনীতিতে প্রবেশ করেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

১.৪ গান্ধীর আবির্ভাব এবং প্রাথমিক আন্দোলনসমূহ

গান্ধীর রাজনীতিতে হাতেখড়ি দক্ষিণ আফ্রিকায়। আইনজীবি হিসাবে সেখানে গেলেও ব্যক্তিগতভাবে বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়ে গান্ধী রাজনৈতিকভাবে সচেতন হন। এর পরে সেখানকার সরকার অ-শ্বেতাঙ্গদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আইন প্রয়োগ করলে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী বা কর্মরত ভারতীয়দের যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার রূপকার ছিলেন গান্ধী।

বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন গান্ধী ভারতবর্ষে ফিরে এসেই সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেননি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে গান্ধী সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাগুলি বোঝার চেষ্টা করেন। ইতোমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলনের আংশিক সাফল্য রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক, কিন্তু সচেতন ভারতবাসীকে এক বিকল্প রাজনীতির সন্ধান দেয়।

গান্ধীর এই বিকল্প রাজনীতির প্রতিভূ হিসাবে আগমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তার আগে অবধি ভারতীয় রাজনীতির তিনটি ধারা—অর্থাৎ কংগ্রেসের নরমপন্থী এবং চরমপন্থী ধারা তথা সশস্ত্র বিপ্লব— কেনটিই কোন প্রত্যক্ষ সাফল্য আনতে পারেনি। সেই তুলনায় গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন (যা ক্রমাগত চেষ্টায় সত্যের দ্বারা বিপক্ষকে তার অন্যায্য অবস্থান প্রসঙ্গে সচেতন করে দেয়) দৃশ্যতই দক্ষিণ আফ্রিকার বৈষম্যমূলক আইন পরিমার্জনে সফল হওয়ায় অনেক বেশী আশাব্যাঞ্জক ছিল। এই আশায় সওয়ার হয়েই চম্পারণের পীড়িত সেখানকার কিছু ব্যক্তি কৃষকদের হয়ে গান্ধীর সাহায্য চেয়েছিলেন এবং সেই সূত্রেই গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতি প্রবেশ।

১.৪.১ চম্পারন সত্যাগ্রহ

বিহারের চম্পারন জেলায় কৃষক অসন্তোষ চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। রামনগর, বেতিয়া এবং মধুবন অঞ্চলের জমিদারদের থেকে ঠিকাদারী লিজ নিয়ে ইউরোপীয় নীলকর সাহেবরা উনবিংশ শতাব্দীতেই তিনকাঠিয়া ব্যবস্থা চালু করে, যার অনুসারে প্রতি এক বিঘা জমির অন্তত তিন কাঠাতে নীল চাষ করতে হবে, এবং তা নামমাত্র মূল্যে নীলকরদের হাতে তুলে দিতে হবে। ১৮৬০-এর দশক থেকেই এর বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা যায়, কিন্তু এই অসন্তোষ চরমে ওঠে ১৯০০ সাল থেকে। ইউরোপে বস্ত্রশিল্পে ব্যবহার্য কৃত্রিম রঙ আবিষ্কারের পরে নীলের চাহিদা বহুল্যাংশে হ্রাস পায়। নীলচাষ তেমন লাভবান না থাকায় নীলকরেরা চাষীদের দুটি বিকল্প দেন নীলচাষ থেকে অব্যাহতি পারার জন্য শারাবেসী (খাজনা বৃদ্ধি) অথবা তাওয়ান (নীলকরের ক্ষতিপূরণ বাবদ থোক অর্থ)। কৃষকেরা এই দাবি মানতে না পেয়ে আবেদন, নিবেদন এবং আদালতে বিচার প্রার্থনা করে বিরোধিতা চালাতে থাকলেও সাফল্য আসে নি।

এহেন পরিস্থিতিতে চম্পারনের এক সম্পন্ন কৃষক রাজকুমার শুক্লা ১৯১৬ সালে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে গান্ধীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রথমে ইতঃস্তত করলেও শুক্লার পীড়াপীড়িতে গান্ধী ১৯১৭ সালে চম্পারণে যান। গান্ধী চম্পারন ঘুরে দেখতে থাকাকালীন তাঁকে ঘিরে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তাতে নীলকর সাহেবরা আতঙ্কিত হয়ে গান্ধীকে বিরত করতে সরকারকে চাপ দেন। সরকার তাঁকে বিরত করার চেষ্টা করলে গান্ধী এর বিরোধীতা করেন। চম্পারনের কৃষক এবং বিহারের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরাও গান্ধীর পাশে দাঁড়ানোতে সরকার গান্ধীর যাতায়াতের থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেয় এবং গান্ধীর দাবি অনুসারে একটি কমিশন নিযুক্ত করে। কমিশনের সুপারিশ অনুসারে তিনকাঠিয়া ব্যবস্থা রদ হয়ে যায় এবং মোট দেয় খাজনা বৃদ্ধির হার ২৬% থেকে কমিয়ে ২০% করা হয়। গান্ধী খাজনাবৃদ্ধির হার কমালেও খাজনাবৃদ্ধি নীতিগতভাবে মেনে নেন কারণ নীলকর এবং কৃষকদের সহাবস্থানের জন্য সংঘাত এড়ানোই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন।

পরবর্তীযুগের সমালোচকদের মতে (যেমন সুমিত সরকার) চম্পারনে তিনকাঠিয়া ব্যবস্থার অবসান ছাড়া গান্ধী প্রকৃত কোন সাফল্য অর্জন করেননি। কিন্তু এই সামান্য সাফল্যের বিশাল একটা মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যও ছিল। ইতিপূর্বে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি বা সংগঠন সাধারণ লোকের দৈনন্দিন কোন সমস্যাকে সমাধানের কোন সরাসরি চেষ্টা করেননি। সে তুলনায় গান্ধীর প্রচেষ্টা এবং সাফল্য (তা সে যতই সীমিত হোক) দুই-ই ছিল সমান অপ্রত্যাশিত। এর ফলে রাতারাতি আঞ্চলিক একটি সমস্যা সারা দেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং গান্ধীর সম্বন্ধে আশার সঞ্চার হয়।

আঞ্চলিক রাজনীতির সূত্র ধরে গান্ধীর সর্বভারতীয় রাজনীতিতে আসার জন্য যে সাংগঠনিক ভিত দরকার ছিল, তাও চম্পারনেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজকুমার শুক্লা, সন্ত রাউত, প্রভৃতি সম্পন্ন চাষী, স্থানীয় মহাজন বণিক, মোক্তার এবং পীর মহম্মদ, হরবন্স সহায়ের মত স্কুলশিক্ষক প্রভৃতি ব্যক্তিরা চম্পারনে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু প্রাদেশিক রাজনীতিতে গান্ধীর প্রভাব বিস্তারে আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন মফঃস্বল এবং শহরতলি অঞ্চলের পেশাজীবিরা। যেমন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, অনুগ্রহ নারায়ন সিনহা, জ.ব. কৃপলানী, প্রভৃতি। জুডিথ ব্রাউন এঁদের বলেছেন গান্ধীর রাজনীতির ''সহ-ঠিকাদার (Sub-

contractor), যাদের সাহায্যে গান্ধীর আঞ্চলিক রাজনীতির সোপান বেয়ে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে উত্তরণ।

১.৪.২ খেড়া সত্যাগ্রহ

চম্পারনের সাফল্যের সুবাদে ১৯১৮ সালে গুজরাতের খেড়া অঞ্চলের বাসিন্দারা গান্ধীর সাহায্য প্রার্থনা করে। এক্ষেত্রে গান্ধীর সাফল্য ছিল খুবই সীমিত, কিন্তু আন্দোলন শুরু করার সুবাদেই গান্ধীর ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়।

গুজরাতের খেড়া অঞ্চলে কুনবি-পতিদার শ্রেণীর জমির স্বত্বভোগী কৃষক শ্রেণী মূলত আমেদাবাদ অঞ্চলের জন্য খাদ্যশস্য, তামাক এবং তুলা উৎপাদন করত। উনবিংশ শতাবাদীতে এরা সমৃদ্ধি উপভোগ করলেও ১৯৮৮ থেকে বারংবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মহামারীর দরুণ অর্থনৈতিক দুঃসময়ের সম্মুখীন হয়। ডেভিড হার্ডিমান দেখাচ্ছেন যে ছোট পতিদার শ্রেণীর পক্ষে এই সঙ্কট আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে কারণ বড় পতিদার শ্রেণীর লোকেরা বৈবাহিক পণ বা যৌতুকের সুবাদে সামাজিক প্রতিপত্তি বজায় রাখলেও, কুলীন না হওয়াতে ক্ষুদ্র পতিদাররা সেই পথ অবলম্বন করতে পারেনি। ১৯১৭-১৮ সালে শস্য ভাল না হওয়ার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য যেমন কোরোসিন এবং নুনের দাম বাড়ে। তার ওপর কৃষি-শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত বাড়াইয়া জাতির লোকেরা তাদের মজুরী বাড়িয়ে নিতে সফল হওয়ায় ক্ষুদ্র পতিদারদের প্রায় নাভিঃশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়।

১৯১৭ সালে খেড়ার বাসিন্দারা গান্ধীর সাহায্য চাইলে গান্ধী প্রথমে ইতস্তত করেন, কিন্তু ১৯১৮ সালে তিন এগিয়ে আসেন। ১৯১৮ সালে শস্য ভাল হওয়াতে খাজনা মুকুবের দাবি সফল হয়নি ঠিকই কিন্তু গান্ধী কিছু ছাড় আদায় করতে পেরেছিলেন।

খেড়ার সত্যাগ্রহের ফলে বিহারের মতই বিহারেও গান্ধী কিছু অনুগামী পেয়েছিলেন। যেমন শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, ইন্দুলাল যাগ্নিক এবং মহাদেব দেশাই। যারা গান্ধীর আঞ্চলিক রাজনীতি ভিত নির্মাণ এবং জাতীয় রাজনীতিতে উত্তরণে সহায়ক হয়েছিলেন। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল খেড়ায় গান্ধীর শুরু করা দীর্ঘমেয়াদী কৃষি-প্রকল্পগুলি। খেড়া অঞ্চলের বহু গ্রামীণ সংগঠন এবং গঠনমূলক কাজের সুবাদে গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে গান্ধীয় রাজনীতির যে দূর্গ তৈরি হয়েছিল তা স্বাধীনতা সংগ্রামে জন আন্দোলনগুলির সময়ে খুব কার্যকরী সাব্যস্ত হয়েছিল।

১.৪.৩ আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ

গান্ধীর খেড়া আন্দোলনের প্রায় সমসাময়িক ছিল আমেদাবাদ শিল্পাঞ্চলে সত্যাগ্রহ। আমেদাবাদে শিল্পাঞ্চলে প্লেগের দরুণ একটি বাড়তি ভাতা দেয়া হত। ১৯১৭ সালে আমেদাবাদের সূতীর মিলের মালিকেরা ব্যায় সঙ্কোচনের উদ্দেশ্যে এই ভাতা বন্ধ করার চেষ্টা করে। মূল্যবৃদ্ধির সময়ে এই পদক্ষেপ শ্রমিক স্বার্থবিরোধী হবার ফলে মিল শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। ভাতা বন্ধের বিনিময়ে শ্রমিকেরা মজুরিতে ৫০% বৃদ্ধি দাবি করেছিল, মালিকেরা ২০% এর বেশি দিতে রাজি ছিল না।

এমতাবস্থায় গান্ধীর গুনমুগ্ধ শিল্পপতি অম্বালাল সারাভাই গান্ধীকে মধ্যস্থতা করতে আহ্বান করেন।

গান্ধী সমাধান সূত্র হিসেবে মজুরির ৩৫% বাড়ানোর কথা বলেন, কিন্তু মালিকেরা প্রথমে তা মানতে রাজি ছিলেন না। ১৫ই মার্চ গান্ধী প্রথম অনশনে বসেন, এবং অনতিবিলম্বেই মালিক পক্ষের সম্মতিআসায় বিষয়টির মীমাংসা হয়ে যায়।

সাধারণত বলা হয় যে, ধর্মঘটী শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করতেই গান্ধী অনশনে বসেন। কিন্তু জুডিথ ব্রাউন জেলা শাসকের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে গান্ধীর মালিকপক্ষের সঙ্গে নৈকট্য নিয়ে শ্রমিকদের বক্রোক্তির ফলেই গান্ধী অনশনে বসেন।

উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, গান্ধীয় রাজনীতির ''সাফল্যের'' ধারাকে অব্যাহত রেখেছিল আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ। মালিক-শ্রমিক সংঘাতকে গান্ধী শ্রেণী সংগ্রামের আলোকে দেখতে নারাজ ছিলেন। তাঁর মতে মালিক-শ্রমিক সহাবস্থান এবং সহযোগীতাই ছিল এঁদের সম্পর্কের মূল কথা। মধ্যস্থতামূলক এই দৃষ্টিভঙ্গী শিল্পপতি গোষ্ঠীকে গান্ধীর প্রতি আকৃষ্ট করে, এবং গান্ধীকে রাজনীতির অন্যতম মূল স্তম্ভ হিসাবে দাঁড়াতে উদ্যোগী করে। অন্য ক্ষেত্রে শ্রমিক এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের চোখে গান্ধীর রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং ভাব মূর্তিকে আরও ইতিবাচক ভবে প্রতিষ্ঠা করবে।

১.৪.৪ রাওলাট সত্যাগ্রহ

সর্বভারতীয় রাজনীতির আঙিনায় গান্ধীর প্রবেশ ১৯১৯ সালে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্র ধরে।

দ্বৈত শাসন প্রকল্পে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে বলে সরকারি এবং বেসরকারি শ্বেতাঙ্গ মহলে এক আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল। এই আশঙ্কা দূর করতে ভারতীয় সামাজিক তথা রাজনৈতিক অধিকারের ওপর যুদ্ধকালীন বিধিনিষেধ স্থায়ী করার সুপারিশ করে বিচারপতি রাওলাটের অধীনে রাজদ্রোহ বিষয়ক কমিটি (১৯১৮)। ওই সুপারিশ অনুসারে ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে ভারত প্রতিরক্ষা আইন (Defence of India Act) বা রাওলাট আইন পাশ করা হয়। এই আইন অনুসারে রাজদ্রোহমূলক কার্যকলাপের সন্দেহের ভিত্তিতেই দুবছর অবধি যে কাউকে বিনাবিচারে বন্দী রাখা যেতে পারে। রাজদ্রোহের সংজ্ঞা রাখা হয় অত্যন্ত ব্যাপক—এমনকি রাজদ্রোহমূলক বলে ঘোষিত পুস্তিকা কারও কাছে পাওয়া গেলে তা হবে রাজদ্রোহের সমান অপরাধ।

যদিও রাওলাট আইন কেবল সক্রিয় রাজনীতিবিদদের কথা ভেবেই তৈরি হয়েছিল, তাও জনমানসে এই আইন চরম ক্ষোভের উদ্রেক করে। এর কারণ ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ তাদের উগ্র, দমনমূলক পন্থার জন্য এমনিতেই কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। সেই পুলিশের হাতেই বর্ধিত ক্ষমতা দেয়ায় রাওলাট আইন সাধারণ ভারতবাসীর অবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়েই দিয়েছিল।

ভারতের রাজনৈতিক জগতের সবাই রাওলাট আইনের বিরোধীতায় মুখর হলেও দেশব্যাপী অহিংস কিন্তু সক্রিয় প্রতিবাদের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন গান্ধী। নরমপন্থীরা চাইছিলেন চিরাচরিত আবেদন নিবেদনেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে। চরমপন্থীরা ব্রিটিশ সরকারকে কর দেয়া থেকে জনগণকে বিরত রাখতে চাইছিলেন। গান্ধী প্রথমে এর পরিবর্তে প্রস্তাব করেন যে, স্বেচ্ছাসেবীরা প্রাকশ্যে নিষিদ্ধ রাজনৈতিক পুস্তিকা বিক্রি করে গ্রেপ্তারবরণ করে রাওলাট আইনকে অকার্যকরী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। পরে,

২৩মার্চ ১৯১৯ সালে গান্ধী ৩০শে মার্চ দেশজোড়া হরতালের ডাক দেন। পরে তিনি হরতালের দিন বদলে ৬ই এপ্রিল ধার্য করেন, যাতে সমস্ত আয়োজন ঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায়।

রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে হরতালের অভিনবত্বই রাওলাট সত্যাগ্রহকে একটা আলাদা মাত্রা এনে দেয়। একটি বিশেষ দিনে একটি বিশেষ কারণে সারাদেশের গতি স্তব্ধ করে দেয়া একাধারে ভারতীয় সংহতি এবং ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকারের সূচক ছিল। ফলে ব্যক্তিগতভাবে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও গান্ধী বিভিন্ন জায়গা থেকে সমর্থন পান। দেশজুড়ে বিস্তৃত হোমরুল সংগঠনগুলি গান্ধীকে লোকবল এবং অর্থবল দিয়ে সহায়তা করে। কারণ ইতিপূর্বে অ্যানী বেসান্তের অন্তরীন হবার বিরুদ্ধে হোমরুল সমর্থকদের গান্ধী সমর্থন করেছিলেন। অনুরূপভাবে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কারাবাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সুবাদে গান্ধী আনসারি এবং মৌলানা আব্দুল বারির নেতৃত্বে উত্তর ভারতের মুসলিম রাজনীতিবিদদের রাওলাট আন্দোলনের সময় পাশে পেয়েছিলেন।

রাওলাট সত্যাগ্রহকে সুসংহত রূপ দিতে গান্ধী স্বয়ং "সত্যগ্রহ সভা" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল প্রচারমূলক পুস্তিকা, ক্রোড়পত্র বিলি করা এবং রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে "সত্যাগ্রহ শপথে" হস্তাক্ষর সংগ্রহ করা। সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস এই আন্দোলনে যুক্ত না থাকলেও মহারাষ্ট্র এবং বাংলায় কংগ্রেস সংগঠন গান্ধীর এই উদ্যোগ সমর্থন করতে এগিয়ে আসে। ব্যক্তিগতভাবে গান্ধী সত্যাগ্রহের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতীয় বিভিন্নশহরে মার্চ এবং এপ্রিল মাসে ঝটিকা সফরে যেতে থাকেন।

সামগ্রিকভাবে দেখলে বোঝা যায় যে সাংগঠনিক দিক থেকে রওলাট আন্দোলন ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এই আন্দোলন সীমিত ছিল মূলত নগরাঞ্চলে এবং এর পুরোভাগে ছিল প্রধানত নিম্নমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ৩০শে মার্চ এবং ৬ই এপ্রিল, দুটি দিনই প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হরতাল পালন করা হয় ভারতবর্ষে অধিকাংশ শহরেই। তবু আন্দোলনের প্রাবল্য অনুভূত হয় অমৃতসর, লাহোর, গুজরানওয়ালা প্রভৃতি পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহরে, আমেদাবাদ, দিল্লী, বম্বে এবং খানিকটা কলকাতায়।

রাওলাট সত্যাগ্রহ প্রবলতম আকার নেয় পাঞ্জাবে। যুদ্ধের আগে থেকেই অর্থনৈতিক কারণে পাঞ্জাবে উত্তেজনার পারদ চড়ছিল। ১৯১৭ সালের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের দাম মজুরীর থেকে চারগুণ বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিস্থিতি এমনিতেই ছিল অগ্নিগর্ভ। এই সময়ে আর্য সমাজের ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ এবং ইকবালের আহ্বানে মুসলিম জাগরণেরও সূত্রপাত ঘটে। ফলে গান্ধী রাওলাট সত্যাগ্রহের ডাক দেয়াতে পাঞ্জাবে ভিন্নধর্মী বহু সামাজিক তথা রাজনৈতিক ধারা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সুযোগ পায়। ৩০শে মার্চ এবং ৬ই এপ্রিলের হরতাল সর্বাত্মকভাবে সফল হওয়াতে হিন্দু-মুসলিম-শিখ ঐক্য দেখে পাঞ্জাবের শাসক ও ডায়ার সন্ত্রাস্ত হয়ে পড়েন, এবং অসন্তোষের প্রাণকেন্দ্র অমৃতসরে সামরিক শাসন জারি করেন। সামরিক শাসন বলবৎ করতে পাঠানো জেনারেল ডায়ার বৈশাখী উৎসবের দিন সমস্ত সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার কথা না জেনে জালিয়ানওয়ালাবাগে বিপুল সংখ্যক লোক জমায়েত হলে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ডায়ার সহস্রাধিক নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। এতে সরকারী মতে ৩৭৯, বেসরকীর মতে সহস্রাধিক লোক প্রাণ হারান।

অমৃতসরের দমনমূলক নীতি পাঞ্জাবের অন্যত্রও অনতিবিলম্বে অনুসৃত হয়। দিল্লীতে গান্ধীকে প্রবেশাধিকার না দেবার প্রতিবাদে ১০ থেকে ১৩ই এপ্রিল লাগাতার হরতাল চলতে থাকে। কিন্তু সমাজের নিম্নবর্ণের সহিংস আন্দোলনের প্রবণতা থেকে মধ্যবিত্তশ্রেণী আন্দোলন থেকে সরে আসে। গান্ধীর বিরুদ্ধে নেওয়া ব্রিটিশ পদক্ষেপের প্রতিবাদে আমেদাবাদে ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু হয় যাতে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা ছিল বেশি। তুলনায় বম্বে ছিল শান্তিপূর্ণ যদিও ১০-১১ এপ্রিল ৪৮ ঘন্টা ব্যাপী বন্ধে বম্বে কার্যত অচল হয়ে যায়। কলকাতায় উত্তরভারতীয় হিন্দু এবং মুসলিমরা হরতালে অংশগ্রহণ করলেও বাঙালী, বিশেষত যুবসমাজের অনুপস্থিতি অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়েছিল।

মুষ্টিমেয় কিছু শহর বাদ দিলে প্রায় সর্বত্রই আন্দোলন কালক্রমে হিংসার দিকে ঝুঁকছিল। বিশেষত আমেদাবাদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধী রাওলাট আন্দোলনকে ''Himalayan Blunder'' বলে প্রত্যাহার করে নেন। (১৮ এপ্রিল ১৯১৯)।

রাওলাট সত্যাগ্রহের সরাসরি কোন সাফল্য নজরে পড়ে না, কারণ রাওলাট আইন রদ করা হয়নি। তবু গান্ধীর রাজনৈতিক উপস্থিতি এই সত্যাগ্রহের মাধ্যমে আঞ্চলিকতার গন্ডী কাটিয়ে উঠে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। শুরু হয় গণ আন্দোলনের যুগ।

১.৫ ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর ভূমিকা

১.৫.১ গান্ধী, সত্যাগ্রহ এবং অহিংস আদোলনের আদর্শ

গান্ধীবাদী রাজনীতি তৎকালীন সমস্ত রাজনৈতিক পন্থার থেকে স্বতন্ত্র ছিল। নরমপন্থী কংগ্রেসীদের মত গান্ধী দীর্ঘদিন স্বরাজের পরিবর্তে স্বশাসনের কথাই বলেছিলেন—১৯৩০ পর্যন্ত গান্ধী ভারতকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার কথাই বলেছিলেন, সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। রাজনৈতিক লক্ষ্য নরমপন্থীদের মত হলেও আবেদন নিবেদনের পরিবর্তে তিনি চরমপন্থীদের মত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পন্থা অবলম্বন করেন। নরমপন্থী উদ্দেশ্যের সঙ্গে চরমপন্থী উপায়ের সমন্বয় সাধন করেই আসে গান্ধীবাদী রাজনীতি, যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য গান্ধীর ''সত্যাগ্রহ'' এবং ''অহিংসা''।

ব্যক্তিগতভাবে গান্ধী ছিলেন নৈরাজ্যবাদী। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না কারণ গান্ধী মনে করতেন রাষ্ট্র ব্যক্তির পূর্ণতর বিকাশকে ব্যাহত করে। লেভ তলস্তয়, জন রাস্কিন এবং হেনরি যোরোর রচনা পড়ে এবং বিলেতে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে গান্ধী উপলব্ধি করেন যে বিশ্বজুড়ে যে আধুনিকতা এবং আধুনিক জীবনযাত্রার প্রসার ঘটে চলেছিল (যার দুই মূল স্তম্ভ হল আধুনিক রাষ্ট্র এবং শিল্প ব্যবস্থা) তাতে মানবিক মূল্যবোধগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছিল। আধুনিক জীবনের যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি পেতে গান্ধী অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার পক্ষপাতী ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন এহেন জীবনযাত্রার সন্ধানে তিনি তলস্তয় এবং ফিনিক্স নামক দুটি আশ্রম পত্তন করেন। সেখানে গান্ধী এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ কিছু অনুগামী শিল্প সভ্যতাকে যথাসম্ভব বর্জন করে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করতেন। গান্ধীর মতে এই গোষ্ঠীবদ্ধ, অনাড়ম্বর জীবনের মাধ্যমেই সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। এবং সত্যের সন্ধান পাওয়াই মানবজীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সত্যের অনুসন্ধান সংক্রান্ত এই ধারণাই ছিল গান্ধীবাদী রাজনৈতিক দর্শনের মূলে। গান্ধীর মতে যাই ব্যক্তির পূর্ণতর বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে তা কার্যত সত্যের পথে অন্তরায় হবে। সেক্ষেত্রে সেই অন্তরায়কে দূর করে সত্য প্রতিষ্ঠাই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য হিংসা বা পেশীবলের আশ্রয় নেয়া যতটা অনৈতিক ততটাই অকার্যকর। উদ্দেশ্য সাধনে হিংসার আশ্রয় নিলে প্রতিপক্ষের মধ্যে যে তিক্ততা আসে তা সমস্যার সমাধান না করে আরও জটিল করে তোলে। তাছাড়া সত্যের স্বরূপ নিশ্চিতভাবে না জানা থাকায় নিজের মতামত জোর করে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়া সত্যের পরিপন্থী।

গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শনের মূল তত্ত্ব ছিল ''সত্যাগ্রহ''। অর্থাৎ সত্যের প্রতি আগ্রহ বা নিষ্ঠা জনিত যে শক্তি। সত্যাগ্রহ বলতে গান্ধী বুঝতেন আলাপ-আলোচনা এবং প্রয়োজনে অহিংস-কিন্তু-সক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারা প্রতিপক্ষের মত পরিবর্তনের নিরলস চেষ্টা। গান্ধীর জীবনদর্শনে মনে করা হত যে ব্যক্তি মূলগতভাবে কখনো অশুভ শক্তির আধার হতে পারে না। কোন ব্যক্তি সত্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে তখনই, যখন সে সত্যের স্বরূপ জানে না। একজন সত্যাগ্রহীর তাই কর্তব্য প্রতিপক্ষকে সত্যের স্বরূপ জানানো এবং তাকে সত্যের পথে ফিরিয়ে আনা।

যে কোন কারণে প্রতিপক্ষ সত্যের স্বরূপ বুঝতে অপারগ হলে একজন প্রকৃত সত্যাগ্রহী সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে নীতিগতভাবে বাধ্য। কারণ সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা গেলেও কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। কিন্তু গান্ধীর মতে সক্রিয় প্রতিরোধ মানে সহিংস আন্দোলন নয়। মানুষ হিংসার আশ্রয় নেয় তখনই যখন সে প্রতিপক্ষের শক্তিকে ভয় পায়, এবং বাহুবলে তাকে পরাজিত করে নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিজেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে। সেক্ষেত্রে স্বপক্ষ বা প্রতিপক্ষ যেই জয়ী হোক, আসলে জয়ী হয় পশু-শক্তি। পরাজিত হয়ে সত্য, মানবিক মূল্যবোধ। পরাজিত পক্ষ নিজের চ্যুতি-বিচ্যুতি বিষয়ে সচেতন না হয়ে প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে—এই বিদ্বেষ পরে আরও জটিল সমস্যার বীজ হয়ে দেখা দেয়। পক্ষান্তরে গান্ধীর মতে প্রতিবাদ অহিংস হলে, পেশী-শক্তি বা পশুশক্তির ওপর নির্ভরশীল না হলে, প্রতিপক্ষের মনে পরিবর্তন আসতে বাধ্য। সত্যাগ্রহী শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তার আদর্শে এবং বক্তব্যে অবিচল থাকলে প্রতিপক্ষের মনে তার নিজের আদর্শ এবং অবস্থান নিয়ে দ্বিধা জন্মাবে। ফলে হিংসার পরিবর্তে বাদানুবাদ সম্ভব হবে, এবং প্রতিপক্ষ শেষ অবধি সত্যের পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হবে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে গান্ধীর মতে অহিংস আন্দোলন মানে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' নয়। সত্যাগ্রহীর প্রতিরোধ সক্রিয় না হলে কার্যকর হবে না, এটা গান্ধী মানতেন। তাঁর অহিংস চেতনা কখনো দুর্বলতাপ্রসূত ছিল না। সত্যের বলে বলীয়ান সত্যাগ্রহীর প্রতিরোধ করার শ্রেষ্ঠ পন্থা ছিল প্রতিপক্ষের কতৃত্বের বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জ করা। শাসনকারীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে তার শাসনের অধিকারকে আক্রমণ করলে সচারচর যে নৈতিক ভিত্তির ওপর শাসনের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে সেই ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যায়। এ হেন প্রতিরোধ অহিংস হলেও সক্রিয়—গান্ধীবাদী রাজনীতির অন্যতম হাতিয়ার ছিল এই অহিংস কিন্তু সক্রিয় প্রতিরোধ।

সক্রিয় প্রতিরোধের উপায় হিসেবে গান্ধী এক অভিনব পদ্ধতি বাতলে ছিলেন। শাসকের নৈতিকতাকে চ্যালেঞ্জ করতে গান্ধী শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশেষ বিশেষ কিছু আইন অমান্য করার ওপর জোর দিতেন। স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে সত্যাগ্রহী শাসককে বুঝিয়ে দিতে যে শাসকের দেয়া শাস্তিকে সে ভয় পায় না অর্থাৎ আইন যে ভীতির ওপর নির্ভর করে কার্যকর হয়, একজন সত্যাগ্রহী সেই ভয়কে জয় করেই এগিয়ে চলে। এছাড়া, গান্ধী প্রতিপক্ষের সঙ্গে অসহযোগের কথা বলতেন। শাসকের কর্তৃত্ব কায়েম থাকতে গেলে শাসিতের তরফ থেকে সেই কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার প্রবণতা থাকতে হবে অর্থাৎ শাসকের কর্তৃত্ব শাসিতের সহযোগীতা ছাড়া কায়েক হতে পারে না। এই সহযোগীতা প্রত্যাহার করে নিলে কর্তৃত্ব ভোগকারী শক্তি বাধ্য হবে তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে রফায় আসতে। এই অসহযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিল সরকারী নীতির বিরুদ্ধে বিপুল জনসমাবেশ এবং প্রয়োজনে হরতাল।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের এই বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে গান্ধীর সত্যাগ্রহে ছিল নিরন্তর আলাপ-আলোচনা তথা আপাস-মীমাংসার ওপর বিশেষ গুরুত্ব। গান্ধী সবসময়েই আপসের মাধমে প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিবাদের মামাংসার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে গান্ধী শুধু আপসের স্বার্থেই আপসের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে কোন ক্ষেত্রেই সত্যাগ্রহী তাঁর মৌলিক উদ্দেশ্য নিয়ে আপস করতে পারে না। কিন্তু মৌলিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে যে কোন গৌণ বিষয় নিয়ে আপসের চেষ্টা করার প্রয়োজন হলে সেই আপস সমর্থনযোগ্য।

বলা বাহুল্য, গান্ধীর এই রাজনৈতিক দর্শন তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপকে আলাদা মাত্রা দিলেও খুব অল্প রাজনীতিবিদই এই পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। তবু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর অহিংস রাজনীতির সামগ্রিক প্রভাব অনস্বীকার্য। এই প্রভাবের মূল কারণ গান্ধীবাদী রাজনৈতিক দর্শন নয়, গান্ধীবাদী রাজনীতির বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যা সেই সন্ধিক্ষণে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

১.৫.২ গান্ধীর আবেদন এবং জনপ্রিয়তা

রাজনীতিবিদ হিসাবে গান্ধী যে আবেদনের সঞ্চার করেছিলনে এবং যে জনপ্রিয়তা উপভোগ করেছিলেন, আধুনিক ভারতের ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের সর্বত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা হিসাবে গান্ধী যে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তাঁর তুল্য স্বীকৃতি যৌথভাবে কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বও বোধকরি উপভোগ করেননি। এর একটা বড় কারণ গান্ধীর রাজনৈতিক ভিত প্রাদেশিক রাজনীতিতে সীমিত ছিল না। প্রথম থেকেই গান্ধীর রাজনৈতিক ভিত উপমহাদেশের প্রাদেশিক বিভাজন অতিক্রম করার প্রবণতা দেখিয়েছিল। কিন্তু গান্ধীর আবেদন এবং জনপ্রিয়তার জন্য গান্ধীয় রাজনীতির প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণ যখন গান্ধী ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন।

গান্ধীর পূর্ববর্তী রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যেকেরই রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল তাঁদের নিজস্ব প্রাদেশিক রাজনীতির অঙ্গনে। তাঁদের ক্ষমতার ভিত্তি প্রাদেশিক রাজনীতিতে থাকার দরুণ তাঁদের প্রভাবও মূলত একটি প্রদেশেই সীমাবদ্ধ থাকত। তাই গোখলে, তিলক, মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি নেতৃবর্গ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় স্তরে প্রভাবশালী হয়ে উঠলেও গোখলে এবং তিলকের প্রভাব মূলত

মারাঠা অঞ্চলে এবং মালব্যের প্রভাব মূলত যুক্ত প্রদেশে সীমাবদ্ধ ছিল। গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ভারতের কোন প্রদেশে না হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় হয়েছিল। সেখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের সান্নিধ্যে এসে এবং তাদের নেতৃত্ব দিয়ে গান্ধী প্রাদেশিকতার সীমা অতিক্রম করেন। তাই ভারতবর্ষে ফিরে আসার পরে গুজরাতের আঞ্চলিক রাজনীতিতে যোগ না দিয়ে গান্ধী সুদূর বিহারে হস্তক্ষেপ করেন। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে যোগদানের আগেই গান্ধীর নেতা হিসেবে যে পরিচিতি গড়ে উঠেছিল তা এই সমস্ত কারণেই অন্যান্য যে কোন নেতার থেকে আলাদা প্রকৃতির ছিল। ১৯১৫ সালে গান্ধী যখন সাবরমতী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ ২৫ জন অনুগামীর ১২ জনই ছিল তামিল ভাষাভাষি, অন্য কোন ভারতীয় নেতার কাছে ছিল অভাবনীয়।

প্রাদেশিক সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে থাকলেও গান্ধী ধীরে ধীরে দেশ জুড়ে তাঁর ক্ষমতার বৃত্ত প্রশস্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন, এবং এই উদ্দেশ্যে সফলও হয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রেও গান্ধী তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী নেতাদের থেকে অনেক বেশি দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। গান্ধীর পূর্ববর্তী প্রজন্মের নেতৃবর্গ যেমন নৌরজি, উমেশ বনার্জী, দিনশ ওয়াচা, ফিরোজ শাহ মেহতা, গোখলে, তিলক —সাধারণত অন্যান্য প্রদেশের সমমনোভাবাপন্ন নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করতেন। সেই আমলে সর্বভারতীয় স্তরের রাজনীতি কংগ্রেসের তিনদিনব্যাপী রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ থাকার দরুণ প্রাদেশিকতার গন্ডী অতিক্রম করার কোন তাগিদও কেউ অনুভব করেননি। দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দরুণ গান্ধী উপলব্ধি করেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংগ্রাম গড়ে তুলতে গেলে রাজনীতির পুরানো ধাঁচ বদলাতে হবে। তিনি উপলব্ধি করেন যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের রাজনীতিকে তৃণমূল স্তরে নিয়ে যেতে হবে, এবং তা সম্ভব করতে গেলে আঞ্চলিক রাজনীতি সচেতন লোকেদের সঙ্গে নিতে হবে। প্রাথমিক আন্দোলনগুলির সুবাদে গান্ধী এরকম কিছু আঞ্চলিক যোগসূত্র স্থাপন করেন যেমন চম্পারন সত্যাগ্রহের সূত্রে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, খেড়ার সূত্রে মহাদেব দেশাই, আমেদাবাদের সূত্রে বল্লভভাই প্যাটেল, ইত্যাদি। এঁরা প্রাথমিকভাবে রাজনীতির লোক না হলেও গান্ধীর সান্নিধ্যে এসে প্রথমে আঞ্চলিক রাজনীতি, এবং পরে গান্ধীর ছত্রছায়ায় সর্বভারতীয় রাজনীতিতে যোগদান করেন। পরবর্তী প্রায় তিন দশক ধরে যখনই গান্ধী কোন অঞ্চলে রাজনৈতিক কারণে গেছেন, তখনই তিনি এ ধরনের যোগ স্থাপনে সফল হন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জুডিথ ব্রাউনের মতে ক্ষমতার এই ''সহ-ঠিকাদার''-দের (Sub-contractors of power) দৌলতে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধী নিজেকে ক্ষমতার মূল ঠিকাদার (Chief Contractor of Power) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। ক্ষমতা এবং প্রভাবের সোপান বেয়ে ওঠার ক্ষেত্রে গান্ধী এবং তাঁর এই আঞ্চলিক অনুগামীরা ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক— উভয়েরই উভয়কে সমান প্রয়োজন ছিল।

রাজনৈতিকভাবে সচেতন লোকেদের সমর্থন পাবার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সাধারণ ভারতবাসীর রাজনৈতিক সচেতনতার বিকাশ ঘটানো। এই ক্ষেত্রেও গান্ধী ঈর্ষনীয় সাফল্য পেয়েছিলেন। প্রাক-গান্ধী পর্বে ভারতীয় রাজনীতির গন্ডী সীমাবদ্ধ ছিল বিভিন্ন দল ও সংগঠনের কার্যকলাপের মধ্যে। তৎকালীন রাজনীতির বিস্তৃতি ছিল মূলত নগরাঞ্চলে, সমাজের উচ্চবিত্ত তথা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একমাত্র সংগঠন ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। প্রাদেশিক এবং

জাতীয় রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক কাঠামোতে ভারতীয়দের উপস্থিতি বাড়ানো। তাই আঞ্চলিক দলগুলি এবং জাতীয় কংগ্রেস উভয়েই প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত বা মনোনীত ভারতীয় জনপ্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানোর দাবি জানান কংগ্রেস ক্রমশ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বের কথা বলছিল, আলিগড়ের নেতৃবর্গ এবং পরে মুসলীম লীগের নেতৃবর্গ প্রথমে নির্বাচনের বিরোধিতা করেন এবং পরে পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীর দাবি জানান। প্রশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কংগ্রেস সিভিল সার্ভিস (Indian Civil Service বা I.C.S)-এ ভারতীয়দের সাফল্যের অনুকূল ব্যবস্থার (অর্থাৎ, পরীক্ষার্থীদের বয়সের উর্দ্ধসীমা বৃদ্ধি) দাবি জানায়, আলিগড় প্রশাসনে মুসলিম যুবকদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি জানায়। শহরের বিত্তশালী এবং পেশাজীবী শ্রেণীভুক্ত লোকেদেরে চাহিদা এই রাজনৈতিক দাবি-দাওয়ায় ধরা পড়লেও বৃহত্তর ভারতের সামাজিক বাস্তবতার কোন ছোঁয়াই এই দাবিসমূহের ধরা পড়েনি। ফলে ভারতের সাধারণ মানুষও এই রাজনীতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি।

রাজনীতির সঙ্গে জনসাধারণের যোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে গান্ধী ভারতীয় ভারতীয় রাজনীতির ব্যাকরণই পাল্টে দিয়েছিলেন। গান্ধী কোন বিমূর্ত রাজনৈতিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করতেন না। সাধারণত বিশেষ বিশেষ উত্তেজক পরিস্থিতিতে গান্ধী এমন কোন বিষয় ঘিরে আন্দোলন করতেন যার তাৎপর্য হত সহজবোধ্য। সর্বভারতীয় রাজনীতির আঙিনায় গান্ধী যতবার আন্দোলনের ডাক দেন, প্রত্যেকবারই তিনি এমন একটি বিষয় বেছে নিয়েছিলেন যা সারা ভারতে সব শ্রেণীর মানুষই সহজে বুঝতে পারবে। সীমিত, শহরে কিছু শ্রেণীর অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক চাহিদা নয় গান্ধীর আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনজনিত ভারতীয় সমাজের দুর্দশা দূর করা। তাই আঞ্চলিক রাজনীতি বা সর্বভারতীয় রাজনীতি, সর্বত্রই গান্ধী বিশেষ বিশেষ সমস্যা দূর করতে সচেষ্ট ছিলেন। জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ, রাওলাট সত্যাগ্রহের সময়। গান্ধী ব্রিটিশ আইনের দমনমূলক চরিত্রের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। রাওলাট আইনকে মূলত রূপক হিসাবে ব্যবহার করে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন ভারতের সবথেকে ধনী এবং সবথেকে দরিদ্র ব্যক্তি ব্রিটিশ শক্তির সামনে সমান অসহায়। তেমনি অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে গান্ধী জনগনকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে ব্রিটিশ শাসনের স্থিতিশীলতা নির্ভর করছে ভারতীয়দের আনুগত্য এবং সহযোগীতার ভিত্তিতে। সেই সহযোগীতা প্রত্যাহার করে নিলে প্রবল প্রতাপশালী ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা ব্যাপক হ্রাস পাবে।

উদ্দেশ্যের সহজবোধ্যতার মতই গান্ধীর রাজনৈতিক পন্থাও ছিল সহজবোধ্য। সংবিধান সভায় ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করে গান্ধী রাজস্বের চড়া হার, কৃষিশিল্প এবং বস্ত্রশিল্পের ওপর ব্রিটিশ শাসনের নেতিবাচক প্রভাব, শ্রমিকদের সমস্যা প্রভৃতি দৈনন্দিন বাস্তবিকতার কথা বলাই গান্ধী শ্রেয় মনে করতেন। এবং এই শোষণমূলক ব্রিটিশ ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে গান্ধী তুলে ধরেন অন্য এক সমাজজীবনের চিত্র যেখানে আধুনিক সভ্যতার কুফলগুলি অনুপস্থিত। ভারতবর্ষের অশিক্ষিত, নিরক্ষর লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীর কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে গান্ধী রামরাজ্যের কথা বলতে থাকেন। রামরাজ্য বলতে গান্ধী কোন হিন্দু রাষ্ট্র স্থাপনের কথা বলতেন না। রামরাজ্য বলতে তিনি এমন এক সমাজব্যবস্থার কথা বলতে যা দাঁড়িয়ে ছিল ন্যায় ও সত্যের মত সর্বজনগ্রাহ্য মূলবোধ্যের উপর। কিবা হিন্দুধর্ম, কিবা ইসলাম, সর্বত্র আদর্শ সমাজব্যবস্থার বুনিয়াদ সত্য এবং ন্যায় হওয়াতে রামরাজ্যে অ-হিন্দু ব্যক্তিদের কোন অসুবিধার অবকাশ

থাকতে পারে না। তাই গান্ধী হিন্দুদের পাশে পেতে রামরাজ্যের কথা বলার পাশাপাশি মৌলানা আব্দুল বারি, আনসারি প্রভৃতি মুসলিম ধর্মপ্রাণ নেতার সাহায্যে মুসলিম সমজের দিকে সমর্থন চেয়ে হাত বাড়ান। গান্ধী বুঝেছিলেন যে আদতে ধর্মপ্রাণ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় বঞ্চিত লক্ষাধিক 'মূর্ক' ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ধ্যানধারণা বিসর্জন দিতে হবে— মানুষকে আহবান জানাতে গেলে রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করলে চলবে না, রাজনীতির স্বার্থেই ধর্মকে আহবান করতে হবে। তবে বলা বাহুল্য, গান্ধীর কাছে ধর্মের উপযোগিতা ছিল সামাজিক মূল্যবোধের আধার, যার মূল উদ্দেশ্য মানুষের সঙ্গে মানুষকে জুড়ে দেয়া, মানুষকে মানুষের থেকে ধর্মের নামে পৃথক করা নয়। গান্ধীর রাজনীতির এই মূল্যবোধ-কেন্দ্রীকতার জন তিনি পাশে পেয়েছিলেন মৌলনা আজাদের মত বিদগ্ধ ব্যক্তি এবং ভারতবর্ষের লক্ষাধিক মানুষকে, যারা পাশ্চাত্যমুখী প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারতেন না। এঁদের কাছে গান্ধী রাজনীতির এক অন্য অর্থ বহন করে এনেছিলেন, যেখানে রাষ্ট্র এবং সমাজ পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত—রাষ্ট্রনির্মাণ যেখানে সমাজকে অস্বীকার করে হতে পারে না। রাজনীতিতে 'মূল্যবোধকে এরকম প্রাধান্য দেয়াতে অগুনতি সমাজকে অস্বীকার করে হাতে পারে না। রাজনীতিতে 'মূল্যবোধকে এরকম প্রাধান্য দেয়াতে অগুনতি ভারতবাসীর মনে হয়েছিল যে এই সংগ্রাম আসলে তার সংগ্রাম, কারণ গান্ধী যে মূল্যবোধের কথা বলেছেন সেটি আসলে তারই মূল্যবোধ। এইভাবেই গান্ধীর ছত্রছায়ায় ভারতে শুরু হয় জনমুখী রাজনীতি।

জনমুখী রাজনীতির সুবাদেই গান্ধীর সঙ্গে ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির যোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু সেটিই একমাত্র কারণ ছিল না। একথা সত্যি যে মন্ট-ফোর্ড আইনে ভোটাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকের সংখ্যা বহুলাংশে বেড়ে যাওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক দলগুলি ক্রমশ জনমুখী হবার প্রচেষ্টা করে চলেছিল। এ রকম পটভূমিকায় গান্ধীর আঞ্চলিক সাফল্য এবং রাওলাট সত্যাগ্রহের সুবাদে দেশ জোড়া পরিচিতির ফলে গান্ধীর রাজনীতির উপযোগিতা সবার কাছেই সহজবোধ্য ছিল। তাই ১৯১৯-২০ সাল থেকেই সর্বভারতীয় রাজনীতির সবথেকে প্রভাবশালী সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতির উদীয়মান তারকা গান্ধীর নৈকট্য যেন অনেকটাই অনিবার্য ছিল।

তবে কংগ্রেসের গান্ধীকে প্রয়োজন ছিল, গান্দীর কংগ্রেসকে কিছু কম প্রয়োজন ছিল না। গান্ধী বুঝেছিলেন যে জনমুখী রাজনীতিকে সাংগঠনিক রূপ না দিলে সে রাজনীতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবে না। ফলে ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসের সদস্য না হলেও গান্ধী কংগ্রেসের কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন করে সংগঠনটিকে জনমুখী করে তোলেন (পরের এককে দেখুন)। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় বিস্তারকে ব্যবহার করে ভারতের প্রতিটি প্রদেশে গান্ধী বকলমে উপস্থিত হতে থাকেন। গান্ধীর পরামর্শে কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে কংগ্রেস ভারতের গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যায়। ১৯২০-এর পর থেকে তাই ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধী এবং কংগ্রেস সমার্থক না হলেও ওথপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে যায় অবশ্যই। গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের সাংগঠনিক উপস্থিতির মাধ্যমে গান্ধীও ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে ওঠেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা হিসেবে।

জনমুখী রাজনীতির সঙ্গে কংগ্রেসের অতি সহজেই মানিয়ে নিতে পারার পিছনেও গান্ধীর বিশাল অবদান ছিল প্রাথমিকভাবে কংগ্রেস বিত্তশালী শ্রেণীভুক্ত লোকেদের সংগঠন হবার সুবাদে জনমুখী হয়ে উঠতে না পারার অন্যতম কারণ ছিল শ্রেণীস্বার্থের সংঘাত। ভূস্বামী শ্রেণীর প্রভাবের দৌলতে কংগ্রেস

প্রথম তিন দশক কৃষক স্বার্থের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেও পারেনি ফলে কংগ্রেসে প্রথম তিন দশক ধরে কৃষকশ্রেণীর কোন উপস্থিতি ছিল না। একইভাবে শিল্পপতিদের সমর্থন ধরে রাখতে শ্রমিকস্বার্থ কংগ্রেসে উপেক্ষিত হয়ে থাকত বিশ্বযুদ্ধের পর অবধি। গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শনে শ্রেণী সংঘাতের পরিবর্তে শ্রেণী সহযোগীতার ওপর জোর দেয়াতে শ্রেণী-স্বার্থ সংক্রান্ত মৌলিক বিরোধটি মিটে যায়।

গান্ধীর সমাজদর্শনের কেন্দ্রে ছিল সদাশয় পিতৃবৎ এক মনোভাব এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা। গান্ধী মনে করতেন জমিদার এবং কৃষক, মালিক এবং শ্রমিক তাদের নিজ নিজ অর্থনৈতিক বলয়ে একে অপরের পরিপূরক। তাঁর মতে জমিদার এবং কৃষকের শ্রেণীগত বিরোধের থেকে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। গ্রামীণ অর্থনীতিতে জমিদারের কৃষককে যতটা প্রয়োজন, কৃষকেরও জমিদারকে ততটাই প্রয়োজন। গান্ধীর চোখে একজন জমিদার কৃষকের ভাল-মন্দের জন্য ততটাই দায়বদ্ধ যতটা এক পিতা তার সন্তানের জন্য দায়বদ্ধ থাকেন। একই ভাবে শিল্পক্ষেত্রে মালিক এবং শ্রমিক পারস্পরিক সহযোগীতার ভিত্তিতে অর্থনীতিকে সচল রাখে, এবং মালিক শ্রমিকের অবস্থার জন্য সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। ফলে গান্ধীর দর্শনে মার্কসীয় শ্রেণী সংঘাত হল বস্তুত এক অবাঞ্চনীয় পরিণতি। আদর্শ পরিস্থিতিতে আন্তঃশ্রেণী বিবাদ সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোক আলোচনার দ্বারা দূর হবে।

গান্ধীর রাজনীতির তত্ত্ব অনুসারে চলতে তাই বিপরীতধর্মী শ্রেণীস্বার্থের মধ্যে আপস করে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে একত্রে সংগ্রাম করার সম্বাবনা ছিল প্রবল। প্রায় সর্বত্র জঙ্গী সংগ্রামের পরিবর্তে আলাপ-আলোচনা এবং নৈতিকতার ওপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি সমস্ত সমস্যাকে সমস্যার মর্যাদা দেয়াতে গান্ধী বিপরীত ধর্মী স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন। ফলত, পূর্বেকার রাজনীতিবিদদের মত গান্ধীর জনপ্রিয়তা কোন বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সব শ্রেণীর কাছেই গান্ধীর জনপ্রিয়তা ছিল অভূতপূর্ব। এই জনপ্রিয়তা গান্ধীর জন আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিশাল অবলম্বন সাব্যস্ত হয়েছিল।

তবু গান্ধীর আবেদন এবং জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে আলোচিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণগুলি গান্ধীর সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে যথেষ্ট নাও হতে পারত। অন্যান্য রাজনৈতিক তথা সামাজিক আন্দোলনের নেতাদের মতই গান্ধী নিছক একজন বড় মাপের ব্যক্তিত্ব হিসাবে সীমিত থাকতে পারতেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে গান্ধী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন জীবন্ত কিংবদন্তী। উপমহাদেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভারতবর্ষের নিরক্ষর, সাধারণ লোকের কাছে গান্ধীর পরিচয় ছিল একজন পরিত্রাতা হিসাবে। গান্ধীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং উপায়ের সহজবোধ্যতা এবং তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা তাঁকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ্‌দের তুলনায় অনেক কাছের মানুষ বলে প্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করেছিল। সাধারণ লোকের সাধারণ সমস্যাগুলিকে জনসমক্ষে আনার ফলে সাধারণের মনে হতে থাকে যে গান্ধী আসলে তাদের লড়াইটাই লড়ছেন। ফলে দেশজুড়ে একটা প্রবণতা দেখা যায়, যে যেখানে উর্দ্ধতন কোন ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়ছে, তার নেতৃত্ব জনমানসে গান্ধীর ওপরে আরোপিত হচ্ছে। যেমন ১৯২১ সালে উত্তর প্রদেশের ভূমিহীন কৃষকেরা মনে করতেন গান্ধী তাদের কৃষিজমি পেতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ওই বছরই আসামের চা বাগানের কুলীরা কাজ

ছেড়ে যাবার সময় বলে যে তারা গান্ধীর আদেশ পালন করছে—যদিও এর মূল কারণ অসন্তোষজনক মজুরী এবং কাজের পরিবেশ বলেই অনুমেয়।

গোরক্ষপুরে ১৯২০-এর দশকের প্রারম্ভিক পর্ব নিয়ে শাহীদ আমীনের গবেষণা দেখাছেছ গান্ধীকে সাধারণ মানুষ নিজের কল্পনার রঙে কেমন ভাবে রাঙিয়ে নিয়েছিল। বহু কৃষক খাজনা দিতে অস্বীকার করে এই বলে যে গান্ধী মহারাজের আগমনের ফলে ব্রিটিশ রাজ্যের সমাপ্তি আসন্ন, তাই ব্রিটিশ সরকারকে খাজনা দেবার আর কোন প্রয়োজন নেই। এলাহাবাদ জেলার কিষাণ আন্দোলন সংক্রান্ত ১৯২১-এর এক গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয় যে জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কৃষকদের ধারণা যে গান্ধী আসলে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে নন, তিনি জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এসেছেন। এরকমভাবে অধিকাংশ ভারতবাসীই তাদের ব্যক্তিগত ক্ষোভ, অভিযোগ, বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে গান্ধীকে দেখতেন। অন্যান্য নেতৃবর্গ যেখানে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামরত বলে পরিচিত ছিল, গান্ধীর সেখানে পরিচয় ছিল সবরকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে থাকা এক জীবনযোদ্ধার। তাই বহুক্ষেত্রে এমন হয়েছে মানুষ নিজের সাফল্যের কৃতিত্বও নির্দ্ধিধায় গান্ধীকে দিয়ে দিয়েছে। প্রতাপগড়ে কৃষকদের জমি থেকে বে-আইন উচ্ছেদ রোখার আন্দোলন ১৯২১ সালে সফল হলে সেখানকার লোকেরা এর জন্য গান্ধীকে কৃতিত্ব দেয়—যদি গান্ধী বা কংগ্রেস নয়, এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বাবা রামচন্দ্র।

দেশের প্রতিবাদী সত্ত্বা হিসাবে গান্ধীর এই ভাবমূর্তি কতকটা জনশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কংগ্রেসের শাখা সংগঠন থাকতে জনজীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই কংগ্রেস কোন না কোন ভাবে উপস্থিত থাকতে পারে। জনশ্রুতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা গান্ধীর ভাবমূর্তি কখনো সচেতনভবে কখনো অচেতনভাবে কংগ্রেস সযত্নে লালন-পালন করতে থাকে। ফলে জনশ্রুতির মাধ্যমে গড়ে ওঠা ভাবমূর্তি বাস্তবতার ধাক্কাতেও ভাঙেনি। বরং বিশের দশকের শেষ লগ্নে কংগ্রেস বেতার, মাইক্রোফোন প্রভৃতি প্রযুক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে শুরু করায় ইতোপূর্বে গান্ধী যাদের কাছে অধরা ছিলেন তারাও সেই কিংবদন্তীর সান্নিধ্যে আসতে পারে। কংগ্রেসের বিশাল জনসমাবেশে সহস্রাধিক লোক যখন একযোগে গান্ধীকে দেখতে এবং শুনতে পায়, শারীরিক দূরত্ব কমলেও কিংবদন্তীর প্রাবল্য কমার পরিবর্তে বাড়তেই থাকে। তবে প্রথম দিকে জনশ্রুতিতে গান্ধীর ওপর যে দেবত্ব আরোপিত হত সেই প্রবণতা ত্রিশের দশকের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়।

গান্ধীর প্রবল রাজনৈতিক আবেদন এবং জনপ্রিয়তা ভারতের গণআন্দোলনকে এক অভিনব মাত্রা এনে দেয়। বিংশ শতাব্দীতে আসমুদ্র হিমাচল যে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং আন্দোলন দেখা দেয় তাতে গান্ধীর নেতৃত্বের যে ভূমিকাটি ছিল বিশ্বের জনমুখী রাজনীতির ইতিহাসেও তা সমান অভিনব। এর আগে কোন একজন ব্যক্তি জনপ্রিয়তার এমন শীর্ষে পৌঁছায়নি যাতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী রাজনীতির প্রবক্তারাও তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন। ১৯১৯ সালে রাওলাট সত্যাগ্রহ, ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলন—সব ক্ষেত্রেই যখন গান্ধী আন্দোলন প্রত্যহারের ডাক দিয়েছেন, ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও অন্যরা সেই ডাকে সাড়া দিয়েছে। এমন কী আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের নেতারাও আন্দোলন প্রত্যাহারের পরে তাঁদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম মুলতুবি করে দেন। সর্বভারতীয়

রাজনীতির স্তরে জাতীয় নেতা হিসাবে এরকম গ্রহণযোগ্যতা অন্য কোন নেতা লাভ করতে পারেননি। বিশের দশক থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতির বিভিন্ন ধারাকে একসূত্রে গেঁথে রেখে দশজোড়া স্বাধীনতা সংগ্রামকে ঐক্যবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত গণআন্দোলনের রূপ দেবার ক্ষেত্রে গান্ধীর নেতৃত্ব নির্ধারকের ভূমিকা নিয়েছিল।

১.৬ সারাংশ

১৯১৮ সালে মহাযুদ্ধ শেষ হলে ভারতবর্ষে ব্যাপক সামাজিক তথা রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা যায়। চার বছরব্যাপী যুদ্ধের পলে ভারতীয় অর্থনীতি তখন এক সংকটের মুখে। কৃষিপণ্য এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর উর্দ্ধমুখী দামের দরুণ জনসাধারণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। বিশেষত নগরাঞ্চলে এই অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ওই একই সময়ে শাসনভার লাঘব করতে এবং ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন পেতে বহু প্রতিশ্রুত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয় মন্ট-ফোর্ড আইনের মাধ্যমে। এই আইনে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার কিছু দায়িত্ব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেয়া ছাড়াও ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়া হয়। এই দুটি কারণে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলি সংকীর্ণ সংসদীয় রাজনীতির বদলে জনমুখী রাজনীতিতে প্রবৃত্ত হন।

প্রকৃত অর্থে ভারতে জনমুখী রাজনীতির জনক ছিলেন গান্ধী। আদতে আইনজীবী গান্ধী পেশাসূত্রে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে সেখানকার সরকার এবং সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণে পীড়িত হন এবং অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিকার দাবি করেন। ভারতবর্ষে ফিরে গান্ধী প্রাদেশিক রাজনীতি বা কোন রাজনৈতিক দলে যোগ না দিয়ে কয়েকটি আঞ্চলিক সমস্যা দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন যা সচরাচর কোন প্রতিষ্ঠিত দল করত না।

গান্ধীর রাজনৈতিক কৌশলের অভিনবত্ব এবং চম্পারন, খেড়া এবং আমেদাবাদে সত্যাগ্রহের সাফল্য আংশিক হলেও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাকে রাজনীতির আঙিনায় নিয়ে আসায় অল্প সময়েই বিভিন্ন প্রদেশে গান্ধী অনুগামী পেতে শুরু করেন। দমনমূলক রাওলাট আইন পাশ কেন্দ্র করে গান্ধী যখন সর্বভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন তাঁর এই প্রাদেশিক রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে সফল আন্দোলনকারীর ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—যদিও রাওলাট সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি।

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর উল্কার গতিতে উত্থানের অন্যতম বড় কারণ রাজনীতিবিদ হিসেবে গান্ধীর অভিনবত্ব। সশস্ত্র সংগ্রামের পথ এড়িয়ে গান্ধী দমন-পীড়নের নৈতিকতার মূলে আঘাত করেছিলেন। তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহের আরও বড় তাৎপর্য হল এতে সাধারণ মানুষও নিজের হাতে এক রাজনৈতিক হাতিয়ার পেয়ে যায়।

গান্ধীর আবেদনের আরেকটা বড় কারণ তাঁর কর্মসূচীর সহজবোধ্যতা। যে কোন আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য সাধারণ লোকের দৈনন্দিন সমস্যার সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত হওয়াতে সব শ্রেণীর লোকের মনে হয় গান্ধী আসলে তাদের লড়াই-এ নেতৃত্ব দিতে এসেছেন। গান্ধীর রাজনীতির এই জনমুখীনতার সুবাদে গান্ধীকে ঘিরে বিভিন্ন অতিকথার (Myth) জন্ম হয় যা তাকে অল্প সময়েই গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা এনে দেয়।

গান্ধীর এই জনপ্রিয়তা এবং আবেদনের সুবাদেই জাতীয় রাজনীতির অঙ্গনে গান্ধী অবিসংবাদী নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং জাতীয় আন্দোলনের মূলস্রোতে ভারতীয় নেতৃবর্গ তাঁর আধিপত্য ধীরে ধীরে স্বীকার করে নেন।

১.৭ সারাংশ

(ক) মহাযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে জনমুখী পরিস্থিতি কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তা আলোচনা করুন।

(খ) ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশকালে গান্ধীর নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলনগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(গ) গান্ধীর অহিংস আন্দোলন তথা সত্যাগ্রহের আদর্শের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

(ঘ) রাজনীতিবিদ হিসাবে গান্ধীর বিপুল আবেদনের কারণ কী ছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

(ক) যুদ্ধকালীন ভারতবর্ষে ''হোমরুল'' আন্দোলনের পুরোভাগে কারা ছিলেন?

(খ) মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড আইনে ভারত শাসন ব্যবস্থায় কোন মৌলিক পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল?

(গ) তিনকাঠিয়া ব্যবস্থা কাকে বলে? গান্ধীর চম্পারন সত্যাগ্রহের সঙ্গে তিনকাঠিয়া ব্যবস্থা কীভাবে সম্পর্কিত?

(ঘ) খেড়া সত্যাগ্রহের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল?

(ঙ) সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর আবির্ভাব কোন সত্যাগ্রহের সূত্র ধরে?

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১. Judik Brown — Gandhi's Rise to Power.

২. Judik Brown — Gandhi : A Prisoner of hope (OUP)

৩. অমলেশ ত্রিপাঠী — স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-১৯৪৭ (আনন্দ পাবলিশার্স)

৪. Sumit Sarkar — Modern India 1885-1947 (Macmillan India)